লিঙ্গস্বরূপ ও যৌনস্বরূপ: নানান আঙ্গিক

ঝুমা চক্রবর্তী

এই প্রবন্ধটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে লিঙ্গ বৈষম্যের প্রেক্ষাপটটি আঁকা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ভাগে যৌনস্বরূপ এবং লিঙ্গস্বরূপের সম্পর্কের নানান তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আলোচিত হয়েছে। আসলে প্রথমটি আলোচনা করলে দ্বিতীয়টি বুঝতে সুবিধে হবে।

ক

আমরা জানি, সেই আদি যুগ থেকে স্ত্রী পুরুষের ভূমিকা ভাগ হয়ে এসেছে। এই বিভাজনের চেহারা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম। নারীবাদীরা অনেকেই বলবেন যে যৌনস্বরূপ হল প্রকৃতি-নির্ধারিত। অনেকেই বলবেন, বলতে বোঝাচ্ছি সাধারণত যৌনস্বরূপ এর ব্যাপারে আমরা মনে করি যে এটি প্রকৃতি-নির্ধারিত। তবে এ ব্যাপারে অন্য মতও আছে যা এই প্রবন্ধে আলোচিত হবে। অপরদিকে সাধারণত মনে করা হয় যে, নারী ও পুরুষের লিঙ্গ-পরিচয় সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিকভাবে নির্ধারিত হয়।

Sex এবং gender-কে আমরা যত সহজভাবে বুঝি, এদের পার্থক্য অত সরল ও স্বচ্ছ নয়। এই দুই category-র মধ্যে যথেষ্ট জটিলতা আছে। এই প্রবন্ধে পরে সেটা আলোচিত হবে। সাধারণত আমরা যা বুঝি সেটা হল—

Sex is determined by nature and gender is determined by culture.

বৃটিশ সমাজতত্ত্ববিদ Anthony Giddens তার বই *The Politics of Climate Change* (2009)-এ একটু অন্যভাবে বলেছেন যে, সাধারণ মত হল, যৌনস্বরূপ হল শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং লিঙ্গস্বরূপ যুক্ত হয়ে থাকে সামাজিক আচরণের সাথে।

Lisa Tuttle *Encyclopedia of Feminism*-এ বলছেন— ... Where as sex refers to the biological anatomical differences between male and female, gender refers to the emotional and psychological aspects which a given culture expects to coincide with physical maleness and femaleness. (1986)। Tuttle পুরুষ এবং নারীর যৌনস্বরূপ এর সাথে লিঙ্গস্বরূপের সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে যৌনস্বরূপকে সাধারণ অর্থে বুঝলেও লিঙ্গস্বরূপকে একজন মানুষের মানসিক গঠন এবং আবেগের সাথে যুক্ত করেছেন।

তাই সাধারণ অর্থে লিঙ্গ-পরিচয় সমাজ-সৃজিত। যৌন-পরিচয় জননাঙ্গ এবং তার নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের দ্বারা নির্ধারিত। লিঙ্গ-পরিচয়ের ক্ষেত্রে সমাজ, নারী এবং পুরুষের আচরণ, ভূমিকা, বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত করে দেয়। লিঙ্গ-পরিচয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর পরিবর্তনশীলতা। এটি দেশ, কাল, সংস্কৃতি এমনকি পরিবার সাপেক্ষে বদলে যেতে পারে। কিন্তু যৌন-পরিচয় অপরিবর্তনশীল বলে মনে করা হয়।

কেউ বলতে পারেন যে সমাজের সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য যদি দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া হয় তাতে ক্ষতি কি? মনে রাখতে হবে যে এই পার্থক্য সামান্য প্রত্যক্ষ নয়। যৌন পার্থক্য-র সাথে ক্ষমতার গঠন জড়িত, এবং এই ক্ষমতা-পার্থক্যকে আমরা বলব পিতৃতন্ত্র। পিতৃতন্ত্র হল একটি তন্ত্র যেখানে পুরুষ থাকে কেন্দ্রে এবং পুরুষের প্রেক্ষিত থেকে নারীর ভূমিকা নির্ধারিত হয়। পৃথিবীতে আদি কাল থেকে এরকম কোনও সমাজ নেই যেখানে পিতৃতন্ত্র নেই। যদিও তার চেহারা বিভিন্ন সমাজে, কিংবা একই সমাজে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম। Kamla Bhasin বলছেন, "... that in patriarchy the broad principles remain the same; men are in control, the nature of this control may differ".[১]

পিতৃতন্ত্রের সাথে লিঙ্গ-বৈষম্যের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এই তন্ত্র ঠিক করে দেয় একটি আদর্শ নারী এবং পুরুষের ভূমিকা কী হবে। Moitra এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> Gender is a cultural construct. Each culture imposes certain norms on the behaviour of men and women. These are prescriptions for appropriate behaviour. Like in most cultures ideally men are expected to be aggressive, assertive and brave among many other things women are expected to be passive, receptive and caring.[২]

পুরুষ-নারীর ক্ষেত্রে সমাজ নির্ধারিত গুণগুলির একটি তালিকা করলে এই বৈষম্যের চিত্রটি স্পষ্ট হবে।

পুরুষ-নারী
বুদ্ধি-আবেগ
মন-দেহ
সংস্কৃতি-প্রকৃতি
বিষয়ী-বিষয়
বাহির-অন্দর

নারী-পুরুষ সম্পর্কে তাই stereotype ধারণাগুলোর কয়েকটি হল—

(১) পুরুষ হল দেহ ও মনের দিক থেকে নারীর তুলনায় শক্তিমান।

(২) পুরুষের জীবনে আর্থিক উপার্জন আবশ্যিক। নারী মূলত সন্তান পালন করবে ইত্যাদি।

লক্ষ করলেই বোঝা যাচ্ছে যে, পুরুষ-নারীর বৈশিষ্ট্যগুলি শুধু ভিন্ন নয়, একটি আরেকটির বিপরীত। এই দ্বিকোটিক বিভাজনে প্রথমটির নিরিখে দ্বিতীয়টিকে নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথমটি যদি P হয় দ্বিতীয়টি non-p, কিন্তু Q নয়।

Gerda Lerner (১৯২০-২০১৩) তার বিখ্যাত বই *The Creation of Patriarchy* (১৯৮৬)-তে মেয়েদের অবস্থান বোঝাতে গিয়ে একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন[৩] —

> Men and women live on stage on which they act their assigned roles equal in importance. The play cannot go on without both kinds of performers. Neither of them 'contributes' more or less to the whole; ... But the stage set is conceived painted, defined by men. Men have written the play, have directed the show, interpreted the meanings of

action. They have assigned themselves the most interesting, more heroic parts, giving women the supporting roles. In other words the problem is not what the women do or are, it is how they are valued, who has the right to assign value.

পুরুষতন্ত্র একটা নাটকের মতো যে নাটকের কাহিনি তাদেরই লেখা, নির্দেশনা তাদের। তারাই ঠিক করে দিয়েছে কার কী ভূমিকা হবে। মেয়েরা কেমন সেটা বিষয় নয়, ওদের কী মূল্য নির্ধারিত হবে, এবং কে এই মূল্যায়ন করবে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।

নারী-বিদ্বেষ প্রকাশ পায় তিনটি স্তরে— Sexism, Patriarchy আর Phallocentrism

a) প্রায়োগিক স্তর যাকে আমরা বলি sexism, তা আমাদের জীবনচর্যায় প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত। যেমন eve teasing বা মেয়েদের উত্তক্ত করাকে sexism বলা হবে।

b) Patriarchy বা পিতৃতন্ত্র হল নারী বিদ্বেষের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। এর শিকড় অনেক গভীরে, যা আছে আমাদের চিন্তার স্তরে।

c) Phallocentrism শব্দটি এসেছে phallus শব্দটি থেকে যার মানে হল পুরুষ যৌনাঙ্গ। Phallocentrism কোনো নৈতিক বা রাজনৈতিক বিভাগকে নির্দেশ করছে না। এটি হল একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকার। যেখানে কেন্দ্রে থাকে পুরুষ। এই phallocentric চশমা (lens) দিয়ে চিন্তা ভাবনার পরিসর বা conceptual space-কে সাজানো হয়। মনে রাখতে হবে যে, phallocentrism হল একটি top-down বা উচ্চ-নীচ শ্রেণিবিভাগ। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে যখন বুদ্ধি / আবেগ, মন / দেহ, সংস্কৃতি / প্রকৃতির বিভাজন করি তখন সবসময় একটি আরেকটির বিপরীত এবং দ্বিতীয়টি সর্বদাই প্রথমটির অধস্তন।

Moitra তার বই *Feminist Thought*-এ Phallocentrism এর খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। Moitra-র ভাষায়, "It means that the tertiary sex - linked male traits are treated as the regulative principles of phallocentrism, it is through these lens the entire conceptual space is perceived, evaluated, organized and re-organized." তিনি আরও বলেছেন, "All that differs from maleness is treated as the 'other', the subordinate the periphery and the background. In this way phallocentrism demarcates a closed conceptual space with a fixed core and fixed periphery."[৪]

এর উৎস সন্ধান করতে গেলে আমরা দেখবো যে মানব সভ্যতার শুরু থেকেই চিন্তার স্তরে এই বৈষম্য কখনও প্রচ্ছন্নভাবে কখনও প্রকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পুরুষ ও নারীর সামাজিক অবস্থান আমাদের প্রাত্যহিক ভাষায় প্রকাশ পায়। বাংলা ভাষায় যেমন ছেলেবেলা, বাপের বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি ইত্যাদি। লক্ষণীয় যে 'বিধবা' শব্দটি আমাদের সমাজে যতটা চর্চিত, বিপরীত শব্দটি নয়। এই বৈষম্য প্রকাশ পায় বিভিন্ন প্রথায় ভাইফোঁটা, জামাইষষ্ঠী ইত্যাদি। কর তাঁর প্রবন্ধ 'যৌন' লিঙ্গ-পরিচয়ের ধারণা ও তার বহুমুখী আখ্যানে বলেছেন, "বহু শব্দ কেবল নারীর ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন ডাইনি, বেশ্যা ইত্যাদি। প্রত্যেক ভাষাতেই কম বেশি নারীর শরীর অথবা যৌনতা প্রকাশের প্রতি এক ধরনের অপমানজনক প্রক্ষেপ থাকে আর সেকথা বলাই বাহুল্য যে এই শব্দগুলি নির্মাণ ও প্রয়োজনের কর্তৃত্ব থাকে পুরুষশাসিত সমাজের হাতেই।" (পৃ. ৭৮)

সবচেয়ে দুঃখের আর আশ্চর্যের বিষয় হল বিখ্যাত চিন্তাবিদ এবং দার্শনিকরা এই বৈষম্যের বীজ রোপণ করেছেন। Prof. Moitra-র ভাষায়, "প্লেটো (428-347 BC) তাঁর *'রিপাব্লিক'* গ্রন্থে ভবিষ্যৎ অভিভাবকদের প্রাথমিক শিক্ষার রূপরেখা দিতে গিয়ে বলছেন যে, শিক্ষানবিসরা যেন কখনও কোনও নারীর ভূমিকা অনুসরণ না করে, সে নারী বয়স্কই হোক বা অল্পবয়সী। তার কারণ হল নারী পতিনিন্দা করেন, সুখের বড়াই করেন; এর অতিরিক্ত নারী দুঃখে কাতর বা দুর্ভাগ্যহত প্রেমাসক্ত অথবা অসুস্থ, বা যে গর্ভযন্ত্রণা অনুভব করছে, তাকেও অনুকরণ করা উচিত নয়।" "So these charges of ours who are to grow up into men of worth, will not be allowed to enact the part of a women, old or young, railing against her husband or boasting of a happiness which she imagines can rival the gods or overwhelm with grief or misfortune much less a women in love or sick or in labour."[৫]

অনুরূপভাবে অ্যারিস্টোটল (284-322 B.C.E.) কান্ট (1727-1804), ফ্রয়েড (1856-1939), এর মধ্যেও এই বৈষম্যের ইঙ্গিত স্পষ্ট। অ্যারিস্টোটল তার *'পলিটিক্স'* গ্রন্থে লিখেছেন যে ক্রীতদাস, মহিলা, শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক সকলেরই মধ্যে reason বা যৌক্তিক ক্ষমতা প্রচ্ছন্নভাবে আছে। দাসের বিচার ক্ষমতা নেই, মেয়েদের সে ক্ষমতা কিছুটা থাকলেও তারা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। "All these persons (freeman and slave, male and female, adult and child) possess in common the different parts of the soul etc... female indeed possesses it, but in a form which remains inconclusive."[৬]

Kamla Bhasin ফ্রয়েড সম্পর্কে বলছেন, "Freud stated that for women 'anatomy is destiny', the female is a deviant human being, lacking a penis and her personality gets determined by the struggle to compensate for this deficiency." ফ্রয়েড সাহেবের কাছে নারী হল ত্রুটিপূর্ণ কারণ পুরুষের যৌনাঙ্গ তাদের নেই। তাদের ব্যক্তিত্ব, মানসিক গঠন হয় এই অপূর্ণতার ওপর ভিত্তি করে। কেউ আপত্তি করে বলতে পারেন যে কান্ট বা মিলের (John Stuart Mill, 1806-1873) দর্শন লিঙ্গ-বিভাজনের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে না থেকে মানুষের কথা বলেছে। Kant-এর Categorical imperative বা মিলের utilitarian principle লিঙ্গ-রাজনীতি বা বিভাজনের ঊর্ধ্বে। কিন্তু নারীবাদীরা এই ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেন না। তারা মনে করেন যে লিঙ্গ-বৈষম্যকে পাশ কাটিয়ে মানুষের কথা বলাই হল এক ধরনের রাজনীতি। এই মনোভাব উদ্দেশ্য-প্রণোদিত।

লিঙ্গ-বৈষম্যের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার—

১. এই অবদমন অন্যান্য অবদমন যেমন রাজনৈতিক, সামাজিক, বর্ণ বৈষম্যের থেকে আলাদা কারণ এখানে নারী-পুরুষের সম্পর্ক শুধু অবদমনের সম্পর্ক নয়, এটি ভালোবাসারও সম্পর্ক। তাই এই অবদমনের চিত্রটা অনেক বেশি জটিল।

২. পিতৃতন্ত্র পুরুষদের জন্য খুব সুবিধাজনক বলে ভাবলে ভুল হবে। মেয়েদের মতোই ছেলেদের কিছু ভূমিকা পালন করতে হয়, যা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক। আদর্শ পুরুষের ভূমিকা পালন না করলে তাদেরকে উপহাস কিংবা অভিযোগ সহ্য করতে হয় নানান ভাবে। স্ত্রীর সাথে সহযোগিতা করলে তাকে 'স্ত্রৈণ' বলে ব্যঙ্গ করা হবে। পুরুষ নম্র হলে তাকে নপুংসকের আখ্যা দেওয়া হবে।

৩. মনে রাখতে হবে যে এই অসম সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েরাও অংশগ্রহণ করে, আসলে শোষিতের এক অংশের অংশগ্রহণ ও সমর্থন ছাড়া কোনো অসম ব্যবস্থাই বহাল থাকতে পারে না।

পরিবারও লিঙ্গ-বৈষম্যের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। পরিবার, ধর্ম, গণমাধ্যম, আইন সবই হল লিঙ্গ-বৈষম্যের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। বেশিরভাগ পরিবারে এক বা একাধিক পুরুষ মহিলাদের শ্রম, উৎপাদন ক্ষমতা, যৌন জীবন, প্রজনন এবং গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ করে। সমীক্ষাগুলো থেকে জানা যায় যে ভারতবর্ষে ৯৩.৭% পরিবারে বাড়ির ছেলেরা মেয়েদের রোজগারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। পরিবারই পরবর্তী প্রজন্মকে পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধে দীক্ষিত করে। পরিবারই আনুগত্য, পক্ষপাতিত্ব ক্ষমতার অসম বন্টনের প্রাথমিক শিক্ষা দেয়। এই ব্যাপারে পরিবার এবং রাষ্ট্র একে অপরের আয়না। Gerda Lerner এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "The family not merely mirrors the order of the state and education of the children to follow it, it also creates and constantly reinforces the order."[৭]

খ

পিতৃতন্ত্র নিয়ে আলোচনা আমাদের দ্বিতীয় আলোচ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই বিভাগে আমরা যৌনস্বরূপ এবং লিঙ্গস্বরূপের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব।

লিঙ্গস্বরূপ এবং যৌনস্বরূপ সম্পর্কে প্রচলিত ভাবনাগুলো মূলত পাঁচ প্রকারের—

১. যৌনস্বরূপ হল প্রকৃতি-নির্ধারিত অন্যদিকে লিঙ্গস্বরূপ হল সমাজ-সৃজিত।

২. লিঙ্গস্বরূপ সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি-নির্ধারিত। অন্যভাবে বলা যায় লিঙ্গ-পরিচয়, যৌন-পরিচয়ে নিহিত। অ্যানাটমি ইজ ডেসটিনি।

৩. লিঙ্গস্বরূপ যৌনস্বরূপকে নির্ধারণ করে।

৪. লিঙ্গ ও যৌন-পরিচয়ের মধ্যে কোনো বিভাজন নেই। বিশ্লেষণধর্মী ঘরানা এবং অবভাসিক ঘরানা এই মতের প্রবক্তা। বিশ্লেষণধর্মী ঘরানা বলবে যে যৌনস্বরূপ এবং লিঙ্গস্বরূপ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। লিঙ্গ-পরিচয় এবং যৌন-পরিচয় একে অপরের আশ্রয়ে গড়ে ওঠে ও পরস্পরকে নির্মাণ করে।

৫. অবভাস-তাত্ত্বিকরা বলবেন দেহ এবং মনের বিভাজন সম্ভব নয় কারণ এরা একই তন্ত্রের দুটি দিক।

যৌনস্বরূপ এবং লিঙ্গস্বরূপের আলোচনা করতে গেলে যৌনস্বরূপ বলতে ঠিক কী বোঝায় তার বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। এই বিষয়ে আমরা একটি স্পষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য আলোচনা পাই হ্যাভলক এলিস (Havlock Ellis, 1859-1939)-এর লেখায়। তিনি যৌনস্বরূপ নির্ণয় করার তিনটি স্তর স্বীকার করেছেন। প্রাথমিক স্তরে স্ত্রী এবং পুরুষ যৌনাঙ্গ হল নিরূপণ করার মাপকাঠি। দ্বিতীয় স্তরটি নির্দিষ্ট হয়েছে প্রজনন ক্ষমতার ভিত্তিতে। তৃতীয় স্তরে পার্থক্য (tartiary difference) করা হয়েছে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে। যেমন পুরুষকে চিহ্নিত করা হয় পুরুষালি লক্ষণের সাহায্যে এবং নারীকে চেনা যাবে মেয়েলী গুণাবলীর মাধ্যমে।

এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে পুরুষালী এবং মেয়েলী গুণাবলী বলতে সমাজ কী বোঝে। উপরোক্ত তিনটি স্তর, জীববিজ্ঞানেও স্বীকার করা হয়। প্রথম স্তরে, জীব বিজ্ঞান অনুসারে যৌন পার্থক্য ক্রোমোজোমের গঠনের ওপর নির্ভরশীল। স্ত্রী শরীরে x এবং পুরুষ শরীরে xy ক্রোমোজোম থাকে। এই স্তরে নারী-পুরুষের যৌনাঙ্গ সাপেক্ষে প্রাথমিক বিভাজন হয়। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে, নারী-পুরুষের বিভাজন অনির্দিষ্ট। এই স্তরে হরমোনের সাহায্যে পার্থক্য করা যেত কিন্তু তা সম্ভব নয় কারণ হরমোন নিঃসরণ ব্যক্তি-বিশেষে ভিন্ন। ফলত, এই স্তরে নারী পুরুষের মধ্যে কোনো স্পষ্ট বিভাজন করা যায় না। তৃতীয় স্তরটি হল, টারশিয়ারি গুণাবলীর পার্থক্যের স্তর। এই স্তরটি মেয়েলী এবং পুরুষালী লক্ষণের ভিত্তিতে হয়। জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, নারী-পুরুষ বিভাজনে প্রকৃতি-অতিরিক্ত পরিবেশেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

জীববিজ্ঞান এবং হ্যাভলক এলিস ছাড়াও ফ্রয়েড এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ফ্রয়েডও তিনটি স্তরের কথা বলেছেন। প্রথমটি হল জৈবিক স্তর যেখানে শুক্রাণু ও ডিম্বানু হল বিভাজনের মাপকাঠি। দ্বিতীয় স্তরটি হল সামাজিক স্তর। এই স্তরে উনি মেয়েলী এবং পুরুষালী গুণের কথা বলছেন। পুরুষালী বলতে স্বনির্ভরতা (autonomy) এবং মেয়েলী বলতে সম্পর্কিত সত্তাকে (relational self) বুঝেছেন। তৃতীয় স্তরে ফ্রয়েড মেয়ে এবং ছেলেদের মানসিক গঠনের কথা বলছেন। ফ্রয়েডের যৌনস্বরূপ নির্ধারণ প্রসঙ্গে Dr. Moitra তার বই *Feminist Thought*-এ বলছেন—

> Freud ... identified three levels of sex linked differences, namely, the primary biological level, for example sperm, egg followed by the social level characterized by masculine and feminine attributes, autonomy and relatedness - mature men are autonomous and women remain related. The third level referred to by him is the psychological or grammatical–manifested as active and passive traits[৮].

জৈবকার্যকারণবাদ (Anatomy is destiny)

যারা মনে করেন প্রকৃতি মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠন করে তাদের মধ্যে ফ্রয়েড অন্যতম। 'Anatomy is destiny'-র একজন মূল প্রবক্তা হলেন ফ্রয়েড। ফ্রয়েড মনে করেন যে শৈশবের অভিজ্ঞতা ও মানসিক অবস্থা পুরুষ ও নারীর ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল স্তম্ভ। ফ্রয়েড সেই অর্থে মানস নিয়ন্ত্রণের প্রবক্তা। তাঁর মতে শৈশ্নিক স্তরে আসার পর থেকেই একটি পুরুষ ও নারী শিশুর জীবনের গতি ভিন্ন হয়ে যায়। শিশুর প্রথম অবস্থায় তার ভালোবাসার বস্তু হল তার মা। মায়ের প্রতি ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে তার শৈশ্নিক দশাতেই দ্বিতীয় অবস্থায় তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। ফ্রয়েডের মতে চার-পাঁচ বছরের পুরুষ শিশুর যৌন কামনা জাগ্রত হয় তার মাকে কেন্দ্র করে। মার প্রতি যৌন কামনার হেতু সে তার বাবাকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখতে শুরু করে। যৌনাঙ্গ নাড়া চড়া করে কল্পনায় সে মাকে নিয়ে সুখ পায়। তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা হয়, বড়োরা শিশুর মনের অবস্থা না বুঝতে পারলেও তাকে যৌনাঙ্গ নিয়ে খেলা করতে বারণ করে। নিষেধের সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গচ্ছেদের ভয়ও দেখায়। পুরুষ শিশুর তখন একটি জটিল মানসিক অবস্থা তৈরি হয়। একদিকে মায়ের প্রতি তীব্র আকর্ষণের ফলে বাবার প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব অথচ একই সঙ্গে বাবার ওপর নির্ভরতা বোধ। এই দুইয়ের যে

টানাপোড়েন তাকে ফ্রয়েড বলেছেন ইডিপাস কমপ্লেক্স (oedipus complex)। একই সাথে তার উপস্থচ্ছেদের ভীতির ফলে এই জটিলতার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এটি একটি মানসিক দ্বন্দ্বের অবস্থা। এই দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য তার অচেতন মনে প্রতিরক্ষণমূলক ব্যবস্থা বা defense mechanism কাজ করে। নিজের অজান্তেই সে বাবার মূল্যবোধকে, নিজের মূল্যতে পরিণত করে। ফলে পুরুষ শিশুর আচরণে বাবার আচরণ প্রতিফলিত হতে শুরু করে। মায়ের প্রতি তার যৌন আকর্ষণ কমে যায়, যদিও ভালোবাসা পুরোমাত্রায় বজায় থাকে। যৌবনে সে মায়ের অনুরূপ একটি নারীকে তার জীবন সঙ্গিনী হিসাবে বেছে নেয়। The original mother-son relationship is reenacted in a new adult heterosexual activity.[৯] মেয়েদের ক্ষেত্রে ইডিপাস জটিলতা পুরুষ শিশুর তুলনায় অনেক বেশি। ফ্রয়েড-এর মতে নিজের উপস্থহীনতার জ্ঞান হবার পর নারী শিশুর মনে একরকম হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়। সে পুরুষ শিশুর প্রতি ঈর্ষা বোধ করে, যাকে 'penis envy' বলা হয়। এই লিঙ্গ-ঈর্ষা বা লিঙ্গের অভাবজনিত হীনমন্যতা বোধ পরবর্তীকালে তাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

আগেই বলা হয়েছে যে প্রথম অবস্থায় পুরুষ এবং নারী শিশুর ভালোবাসার বস্তু হয় তার মা। ইডিপাস স্তরের দ্বিতীয় অবস্থায় উপস্থহীনতার জন্য সে মাকে দায়ী করে, কারণ সে মনে করে মাও তার মত উপস্থহীন। এই অবস্থায় সে পিতার প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করে, তার আকাঙ্খা হয় পিতার থেকে একটি পুত্র সন্তান লাভ করার। অর্থাৎ ইডিপাস স্তরে মায়ের প্রতি রাগ ও পিতার প্রতি অনুরাগ দেখা দেয়। একদিকে মায়ের প্রতি ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব এবং অন্যদিকে মায়ের প্রতি নির্ভরতা তার মধ্যে সৃষ্টি করে এক মানসিক দ্বন্দ্ব ও জটিলতা। পরে সে যখন তার চাহিদার অবাস্তবতা বুঝতে পারে তখন অবচেতনভাবে তার মানসিক দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করার জন্য আত্তীকরণ (inculcation) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের অজান্তেই মায়ের মূল্যবোধকে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত করে। এর ফলে একদিকে যেমন বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং ভালোবাসা পাওয়া তার পক্ষে সহজ হয় তেমনি মায়ের সঙ্গেও সে নৈকট্য অনুভব করে। বাবার প্রতি অবদমিত কামনা অন্য পুরুষের প্রতি যৌন আকর্ষণ রূপে প্রকাশিত হয়। ছেলেরা বড় হয়ে যেমন বিচ্ছিন্ন (detached) হয়ে যায়, মেয়েরা কখনোই তা হয় না, কারণ নানান মানসিক পরিবর্তন সত্ত্বেও মায়ের প্রতি অনুরক্তি তার থেকেই যায়, তার সত্তা হয় সম্পর্কিত, কোনো অবস্থাতেই সে বাবা-মার থেকে বিযুক্ত হতে পারে না। একদিকে সে ভালোবাসা পেতে চায়, অন্যদিকে সে ভালোবাসতে চায়।

ফ্রয়েড ছাড়াও জৈবকার্যকারণবাদ বিভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে স্বীকৃত হয়েছে। কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, ধর্মীয় ভাবনা বিশ্বাস করে যে মেয়েলী এবং পুরুষালী গুণগুলি প্রকৃতির মধ্যে নিহিত। বিজ্ঞানের দিক থেকে এরকম ভাবনার পরিণতি হল জৈবিক সারসত্তাবাদ (biological essentialism)। বিভিন্ন ধর্ম স্বতঃসিদ্ধভাবে মেনে নেয় যে নারী পুরুষের জননাঙ্গ এবং শারীরিক বিভেদই লিঙ্গ-বৈষম্যের কারণ। পায়েল করের ভাষায়, "সমস্ত শরীরী মূল্যায়নের পরাকাষ্ঠারূপে পুরুষ শরীরটি আদর্শ নীতি নির্ধারক হয়ে উঠেছে। পুরুষ যেখানে সবসময় বিষয়ীরূপে সংজ্ঞায়িত হয়েছে, নারী সেক্ষেত্রে বিষয়ে রূপান্তরিত হয়েছে এবং এহেন বিষয় চূড়ান্ত মানবতার আদর্শ প্রতিনিধি পুরুষের মাপকাঠিতে কেবলমাত্র বিচার্য হতে পারে।"[১০]

ফলত, সামাজিক রীতিনীতি সব কিছুর নিয়ন্ত্রক হল পুরুষ। প্রাকৃতিক কারণেই নারী ত্রুটিপূর্ণ। তাকে পুরুষের নিয়ম অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করতে হবে। এই তত্ত্বকে আমরা প্রকৃতি নিয়তিবাদ (nature determinism) বলেও আখ্যা দিতে পারি। বেশিরভাগ ধর্ম অনুসারে প্রকৃতি নির্ধারণ করছে নারীর নিয়তি। খ্রিষ্টধর্মে ঈশ্বর প্রথমে সৃষ্টি করেছেন পুরুষকে, তারপর নারীকে। নারী হবে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল। সে প্রত্যেক কাজে পুরুষকে অনুসরণ করবে। একই ভাবনার অনুরণন পাই বিভিন্ন ধর্মে। সনাতন ধর্ম অনুসারে নারীর শরীর হল অপবিত্র।[১১] সনাতন ধর্মের স্বীকৃত ধর্ম-গ্রন্থ *মনুস্মৃতি* অনুসারে নারী অলস, চরিত্রহীন, কামাসক্ত। তার কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। শিশু বয়সে সে থাকবে পিতার অধীনে, যৌবনে থাকবে স্বামীর অধীনে এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে। ইসলাম ধর্ম বলছে শারীরিক কারণেই নারীর শৃঙ্খলিত হওয়া জরুরী। তার কোনো স্বাধীন চিন্তা করার অধিকার নেই। পুরুষের একটি প্রধান কাজ হল নারীর ক্রিয়াকলাপের ওপর নজর রাখা।

এতো গেল ধর্মের কথা। কিছু ক্ষেত্রে বিজ্ঞানও জৈব কার্যকারণবাদ সমর্থন করেছে। বহুবিধ বৈজ্ঞানিক গবেষণা মনে করে যে নারীর স্বভাব অনেকটাই প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত। উনবিংশ শতাব্দীতে নারীকে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হত কারণ বিজ্ঞান অনুসারে বেশি বুদ্ধির প্রয়োজনীয় কাজ নারী করলে তার জরায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১২] কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মনে করেছিল যে ঋতুমতী হবার কারণে মেয়েরা দুর্বল। পুরুষের তুলনায় তার কর্মক্ষমতা কম। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুসারে নারীর বুদ্ধি তার মস্তিষ্কের আয়তন দ্বারা নির্ধারিত। পুরুষের তুলনায় তার মস্তিষ্কের আয়তন কম বলে সে কম বুদ্ধিমান।

'Anatomy is destiny' অর্থাৎ শরীরই ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক বিষয়ে বিতর্ক নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। *Women Men and Gender : Ongoing debates* by Mary Roth Walsh (1997) গ্রন্থে "Are Gender Difference Wired into our Biology" প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা আছে।

১৯৫৯-১৯৬১ সালে সদ্যোজাত শিশুদের নিয়ে একটি সমীক্ষা হয়েছিল। শিশুদের ক্রমবর্ধমান বিকাশকে চিহ্নিত করা ছিল এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য। এই ব্যাপারে মায়েদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। ক্রমবর্ধমান ধাপগুলি যথাক্রমে (সব ধাপগুলি বিস্তারিত উল্লেখ করা হচ্ছে না)[১৩]

—গর্ভ অবস্থায় শিশুর মাথা তুলতে পারা।

—জন্মের পর হামাগুড়ি দেওয়া, দাঁড়ানো, কোনো বস্তুর দিকে এগিয়ে যাওয়া।

—অবলম্বন ছাড়াই বসতে পারা, হাঁটতে পারা ইত্যাদি।

সমস্ত তথ্যগুলি নথিভুক্ত করে বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষণের ফলাফল অনুসারে যা উঠে আসে—মেয়ে শিশুরা তাড়াতাড়ি কথা বলতে পারে কিন্তু হামাগুড়ি দেওয়া, কোনো অবলম্বন ছাড়াই হাঁটতে পারার ব্যাপারে তারা ছেলে শিশু অপেক্ষা কম দক্ষ। গবেষণার ভিত্তিতে আরও জানা যায় যে মাতৃজঠরেই হরমোন নিঃসরণের তারতম্যের ফলে পরবর্তীকালে আচরণের তারতম্য ঘটে। এই পার্থক্য গর্ভের দ্বিতীয় মাস থেকেই শুরু হয়। এই গবেষণা খুব স্পষ্টভাবেই জৈবিক কার্যকারণবাদকে সমর্থন করে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠতে পারে যে,

এগুলি পক্ষপাতদুষ্ট। এক্ষেত্রে, শিশুর বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে milestone গুলি পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে। যে পর্যবেক্ষণগুলি নথিভুক্ত হয়েছে তার মধ্যে ভুল থাকতে পারে। হতেই পারে যে মায়েরা তাদের অবচেতনেই শিশুকে বলিষ্ঠ হিসাবে দেখতে চাইছেন এবং তাদের পর্যবেক্ষণ তাদের মানসিকতার দ্বারা প্রভাবিত। সুতরাং এই তত্ত্ব এবং তথ্যগুলির ব্যাপারে প্রশ্ন থেকেই যায়।

Biological determinism বা জৈব নিয়ন্ত্রণবাদ মানলে বলতে হয় যে লিঙ্গ-পরিচয় সম্পূর্ণ ভাবে প্রকৃতি-নির্ধারিত। মেয়েরা স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিকভাবেই দরদী। সন্তান পালনই তাদের প্রধান কাজ। পুরুষ হল দেহ ও মনের দিক থেকে নারী অপেক্ষা বেশি শক্তিমান। তাদের সমাজের অন্যান্য সকলের (নারী, শিশু, বৃদ্ধ) সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। জৈব নিয়ন্ত্রণবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হল কৃষ্টির বৈচিত্র্য (variation of culture)। নারীবাদীরা যদি সারসত্তাবাদ স্বীকার করে তাহলে যৌনস্বরূপ এর মতো লিঙ্গস্বরূপকে দেশ, কাল, সমাজ নির্বিশেষে একই হতে হবে। কিন্তু যৌনস্বরূপ পৃথিবীব্যাপী এক হলেও বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন সংস্কৃতিতে লিঙ্গস্বরূপ আলাদা। এর কারণ খুব স্পষ্ট। লিঙ্গস্বরূপ হল সমাজ-সৃজিত। কিন্তু নারীকে পুরুষত্বের অভাব হিসাবে দেখার বা পুরুষের অপর হিসাবে দেখা সমস্ত সমাজে নানান চেহারায়, নানা রূপে প্রচলিত। Common sense বা সাধারণ বুদ্ধি বলে যে শিশুর বেড়ে ওঠায় কিংবা একটি মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে তার প্রকৃতি এবং পরিবেশ, উভয়েরই প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া জৈব নিয়ন্ত্রণবাদ বা ফ্রয়েডের মানস নিয়ন্ত্রণবাদ আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার সাথে মেলে না। অনেক পুরুষই হয় শান্ত, নম্র, অন্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আবার একই মানুষ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রকম আচরণ করে। পিতা হিসাবে যে মানুষ নম্র, সেই একই মানুষ হয়তো শিক্ষক হিসাবে খুবই কঠোর। আবার একজন মা হয়তো তার ছেলে মেয়েদের অত্যাধিক শাসন করেন, কিন্তু শিক্ষিকা হিসাবে তিনি ছাত্র দরদী। Freud-এর জৈব নিয়ন্ত্রণবাদের তত্ত্বের দুর্বলতম বৈশিষ্ট্য হল এই তত্ত্বকে সমালোচনা করা যায় না, তার কারণ ফ্রয়েডের তত্ত্বের মূল ভিত্তি হল অচেতন / অবচেতন মন; কারণ অবচেতন মনের সাহায্যে যে কোনো জোরালো সমালোচনাকে ওনার তত্ত্ব নস্যাৎ করে দেয়। জৈব নিয়ন্ত্রণবাদ আসলে এক ধরনের সারসত্তাবাদ। বেশিরভাগ নারীবাদী তত্ত্ব সারসত্তাবাদকে মেনে নেবে না। যৌনস্বরূপ এবং লিঙ্গস্বরূপের সম্পর্ক বিষয়ে নারীবাদী তত্ত্বগুলির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। একদল নারীবাদী অন্য একটি প্রেক্ষিত থেকে সারসত্তাবাদ স্বীকার করেন। তারা মনে করেন যে সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নারী-পুরুষের ভিন্ন ভূমিকা থাকা দরকার। তাদের মতে যৌন পরিচয়ের নিরিখে নারী উন্নতমানের জীব। তাদের ত্যাগ, সহনশীলতা, দরদী মন পুরুষের গুণের তুলনায় উন্নত স্তরের। এই গুণগুলি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাদের অন্দরমহলেই থাকা কাম্য; তাহলে বাইরের জগতের দূষণ থেকে তারা সুরক্ষিত থাকবে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে Moitra বলছেন, "They are the privileged possessors of virtues like purity, patience, self sacrifice, spirituality and maternal instinct of nurturing and caring. Having attributed these virtues she is labelled as the superior sex whose secluded protection need to be perpetuated for the sake of value preservation?"[১৪] লক্ষ করার বিষয় হল এই দৃষ্টিভঙ্গি মেয়েদের ক্ষমতায়নে কোনোরকম সাহায্য করে না। লিঙ্গ-বৈষম্য আসলে ক্ষমতা ভোগের বৈষম্যের গল্প। উপরোক্ত তত্ত্ব তাই

অধিকাংশ নারীবাদীরা সমর্থন করবেন না। Val Plumwood (1939-2008) এই প্রসঙ্গে বলছেন যে ক্ষমতা বন্টনে অসম ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন না এলে নারীসুলভ গুণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে কোনো লাভ নেই। Moitra এই প্রসঙ্গে বলছেন, "Val Plumwood correctly observes that what is missing in this analysis is the role of power. Powerlessness has forced women to cultivate patience, tolerance, purity as stratagems for survival and in their case the only way to continue nurturing these virtues is to remain powerless."[১৫] তার মতে ক্ষমতার অভাবই নারীকে পবিত্র, ধৈর্য্যশীল, দরদী হতে বাধ্য করেছে।

লিঙ্গস্বরূপের যৌনস্বরূপ থেকে মুক্তি

ষাট সত্তরের দশকে রবার্ট স্টোলার (Stoller,1924-99)-এর *Sex And Gender: The Development of Masculinity And Femininity* আলোচনার ভিত্তিতে পুরুষ এবং নারীর দ্বিকোটিক বিভাজন খুব স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হল। আসলে তাঁর বইতে স্টোলার পুরুষ ও নারীর জন্যও লিঙ্গ বিভাজনকে স্পষ্ট করলেন। স্টোলার বলছেন যে যৌনস্বরূপ জৈবিক বৈশিষ্ট্যের সাথে যুক্ত, আর মানসিক গঠনের সাথে লিঙ্গস্বরূপ সম্পর্কিত। মানসিক গঠনে সমাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক পরিস্থিতি, পরিবেশ, অভিভাবকদের আচরণ, শিক্ষক শিক্ষিকার আচরণ শুধু মন নয় শরীরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যৌনস্বরূপ প্রকৃতি-নির্ধারিত কিন্তু লিঙ্গস্বরূপ সমাজ-সৃজিত। স্টোলার তাই লিঙ্গস্বরূপকে জৈবিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করেছেন। পরবর্তীতে যৌনস্বরূপ এবং লিঙ্গস্বরূপের বিভাজনের তত্ত্বগুলোতে স্টোলারের প্রভাব স্পষ্ট। একটু ভিন্ন স্বরে কথা বলছেন আস্তা ক্রিস্টিনা সেনডটি (Asta Kristina Sviendottie) *The Metaphysics of Gender* (2011) বইতে তিনি বলেন যে, পরিবেশ এবং পরিস্থিতি লিঙ্গ নিরূপণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলেই লিঙ্গস্বরূপ অজৈবিক। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন গুণের সমষ্টি লিঙ্গ নির্ধারণের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। যেমন প্রজনন ক্ষমতা, যৌনতা, স্বীয় শনাক্তকরণ ইত্যাদি। "In different contexts different features serve as a base features for the conferral of gender." (role in biological reproduction, sexual roles, self identification etc.) Natlie Stoljar[১৬] লিঙ্গস্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে ভিন্ন সুরে কথা বলছেন। তার মতে লিঙ্গ হল একগুচ্ছ গুণের ধারণা যা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে থাকতে পারে। "The concept of gender is a cluster concept. There are no features that only women share". আসলে সব গুণই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে থাকতে পারে। সমাজ যখন নির্ধারিত করে যে আদর্শ নারী এবং আদর্শ পুরুষের কী কী গুণ থাকবে, তখন আমরা আমাদের কৃষ্টি অনুসারে নিজের অজান্তেই আদর্শ নারী বা পুরুষ হবার চেষ্টা করি।

যৌনস্বরূপ সমাজ-নির্ণীত

বিভিন্ন সময় যৌনস্বরূপ ঠিক করার মাপকাঠিগুলোর দিকে লক্ষ করলে আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে শুধু লিঙ্গস্বরূপই নয় যৌনস্বরূপও সমাজ ঠিক করে দেয়। যৌনাঙ্গের ভিত্তিতে যৌনস্বরূপ ঠিক করার নিয়ম অনেকদিন আগেই বদলে গেছে। সেই অষ্টাদশ শতকে যৌনস্বরূপ চিহ্নিত হত জরায়ুর ভিত্তিতে। উনবিংশ শতকে জরায়ুর পরিবর্তে যৌন গ্রন্থিকে বিবেচনা করা হল। বিংশ শতাব্দীতে তা হল হরমোন এবং ক্রোমোজোমের গঠন। মূলত ষাট

সত্তরের দশকে ক্রোমোজোমের গঠন গুরুত্ব পায়। যৌনস্বরূপ নির্ণীত করার বিভিন্ন মানদণ্ড বিজ্ঞান শাস্ত্রের ক্রমোন্নতির জন্য হয়েছে এ কথা বলা যাবে না। যৌনস্বরূপ বা সেক্স সংক্রান্ত ভাবনার এত পরিবর্তন সত্ত্বেও শরীরবৃত্তীয় চিকিৎসায় এর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই না। যুগ যুগ ধরে নারী-পুরুষের দ্বিবিভাজন স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানের উন্নতি এই চিরাচরিত ভাবনার কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। অনেক সময় একটি শিশুর xy ক্রোমোজোম থাকা সত্ত্বেও পুরুষাঙ্গের অভাবে তাকে মেয়ে বলে গণ্য করা হয়; তা না হলে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পুরুষের যৌনাঙ্গ নির্মাণ করে নারী-পুরুষের বিভাজনকে টিকিয়ে রাখা হয়। এইভাবে শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে যৌনাঙ্গের পুনর্গঠন করে চিকিৎসাশাস্ত্র প্রমাণ করে যে তারা পিতৃতান্ত্রিক ভাবনার কাঠামো থেকে একটুও সরে আসেনি। এই প্রসঙ্গে Moitra বলছেন, "Recent researchers have shown that human beings are species with relatively little sexual dimorphism. In spite of these changes ... medical practitioners continue to be guided by binaries of external genetalia."[১৭]

তাহলে বলা যায় যে, যৌনস্বরূপ নির্ধারণেও সামাজিক চিন্তন কাঠামো কাজ করে। সারা হাইনামার লেখায় এই বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা দেখতে পাই। তার মতে যৌনস্বরূপ সম্পর্কে বিজ্ঞানের পরিবর্তন হলেও চিকিৎসাশাস্ত্রে যৌনস্বরূপ সম্পর্কে অস্পষ্টতা আজও ত্রুটি হিসাবে গণ্য করা হয়। বোঝাই যাচ্ছে যে পিতৃতান্ত্রিক ভাবনার কাঠামো কত বলিষ্ঠ। এই ভাবনায় তৃতীয় লিঙ্গের কোনো স্থান নেই। বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের এই বিরোধী মনোভাব ও আচরণ আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে বিষমকামিতা (heterosexuality) পিতৃতান্ত্রিক চিন্তন কাঠামোর কত গভীরে। Moitra এই প্রসঙ্গে বলছেন, "This shows how fixed the traditional beliefs of sex are, it also shows these beliefs are entrenched is a tradition of heterosexuality."[১৮] সেই আদি কাল থেকে ধর্মে, বিজ্ঞানে, কৃষ্টিতে নারী / পুরুষের বিভাজন সমর্থিত। এই বিভাজনের অপরিবর্তনশীলতা প্রমাণ করে যে লিঙ্গস্বরূপের মত যৌনস্বরূপও একটি নির্মাণ। বিজ্ঞানের তত্ত্ব চিকিৎসকদের ভাবনার পরিবর্তন আনতে পারেনি। শল্যচিকিৎসকদের লিঙ্গ নির্মাণ বা লিঙ্গ পুনর্গঠনের প্রয়াস এই বিশ্বাসেরই প্রকাশ। নারী-পুরুষ বিভাজন ব্যতীত তৃতীয় কোনো সম্ভাবনাকে স্বীকার করা হয় না। খুব তলিয়ে ভাবতে গেলে বোঝা যায় যে আসলে লিঙ্গস্বরূপই যৌনস্বরূপকে নির্ধারণ করে। Moitra লিখছেন, "The category of transsexuality do not figure in this debate of the identity of sex and sexuality in spite of the fact that the 'normal' male/female categories display a considerable amount of transsexuality".[১৯]

"Sex has not been variously interpreted as a biological category at times sex has also been understood as a product of gender. That means that the meaning of sex and sexuality has been constituted by the way gender has been constructed."[২০]

লিঙ্গস্বরূপ এবং যৌনস্বরূপের সম্পর্ক বিষয়ে প্রচলিত অর্থগুলি থেকে আমরা অনেকটাই সরে এসেছি। এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা করলাম, তাতে যৌনস্বরূপ এবং লিঙ্গস্বরূপ সম্পর্কে তিনটি মত পেলাম।

—যৌনস্বরূপ প্রকৃতি-নির্ধারিত এবং যৌনস্বরূপ লিঙ্গস্বরূপকে নির্ধারণ করে বা প্রকৃতি যৌনস্বরূপকে নির্ধারণ করে।

—যৌনস্বরূপ প্রকৃতি-নির্ধারিত কিন্তু লিঙ্গস্বরূপ সমাজ-সৃজিত।

—শুধু লিঙ্গস্বরূপ নয় যৌনস্বরূপও সমাজ-সৃজিত। আমরা আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলতে পারি যে আসলে লিঙ্গস্বরূপই যৌনস্বরূপকে নির্ধারণ করে।

যৌনস্বরূপ ও লিঙ্গস্বরূপের মধ্যে কোনো বিভাজন নেই

যৌনস্বরূপ এবং লিঙ্গস্বরূপ-এর প্রচলিত ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছেন Third Wave Feminist-রা। তারা মনে করেন যে নারী পুরুষের এই দ্বিকোটিক বিভাজনের মধ্যেই বৈষম্যের বীজ আছে। বিশ্লেষণধর্মী ঘরানা এবং অবভাসিক ঘরানা এই বিভাজনকে স্বীকার করতে চাইবে না। বিশ্লেষণধর্মী ঘরানার প্রবক্তা হিসাবে আমরা পাই Sandra Harding, Judith Butler প্রমুখ দার্শনিক যাঁরা মনে করেন যে প্রকৃতি এবং সংস্কৃতির মধ্যে কোনো স্পষ্ট বিভাজন নেই। দুটোই একে অপরকে প্রভাবিত করে। যৌন-পরিচয় এবং লিঙ্গ-পরিচয় একে অপরের আশ্রয়ে গড়ে ওঠে এবং পরস্পরকে নির্মাণ করে। এই নির্মাণ প্রক্রিয়া কখনো থেমে থাকে না; এটি সদা পরিবর্তনশীল। প্রকৃতি এবং সংস্কৃতির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক এরা স্বীকার করেন। কিন্তু প্রশ্ন হল প্রকৃতি এবং সংস্কৃতির মধ্যে এই কার্যকারণ সম্পর্ক কীভাবে কাজ করবে? এঁদের মতে কার্যকারণ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটা প্যাটার্ন আছে। যেকোনো একটি আরেকটিকে প্রভাবিত করার পর দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে প্রভাবিত করবে। এই ভাবনার নিহিতার্থ হল প্রকৃতি এবং সংস্কৃতির মধ্যে অস্পষ্ট হলেও, বিভাজনকে মেনে নেওয়া। এই বিভাজন আরও স্পষ্ট হয় যখন বিশ্লেষণধর্মী ঘরানা দেহ-অনপেক্ষ জ্ঞান স্বীকার করেন। বিশ্লেষণধর্মী ঘরানা দুই প্রকারের জ্ঞান স্বীকার করে।

১. এক প্রকার জ্ঞান যা দেহ-অনপেক্ষ। যেখানে জ্ঞানের ক্ষেত্রে শরীরের ভূমিকা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে।

২. অন্য প্রকার জ্ঞানে বা দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানে দেহকে বিষয়ীতা রূপে স্বীকার করা হয়।

এই আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট যে তাদের তত্ত্বে অসঙ্গতি আছে। একদিকে তারা প্রকৃতি এবং সংস্কৃতির বিভাজন মানতে চাইছেন না, অন্যদিকে দেহ-অনপেক্ষ জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করছেন। এই ভাবনার নিহিতার্থ হল জ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈষম্য স্বীকার করা। প্রকারান্তরে ক্ষমতার অসম বন্টন বা ক্ষমতার বৈষম্যকে স্বীকার করা। ফলত, বৈষম্যকে তারা তাদের তত্ত্ব-কাঠামো থেকে নির্মূল করতে সক্ষম হননি।

অবভাসিক তত্ত্ব

এই প্রেক্ষাপটে আমরা হাইনামাকে দেখবো শরীর, যৌনতা, মন সম্পর্কে এক নতুন ব্যাখ্যা দিতে। আমরা বহুবার বলেছি যে নারী-পুরুষের পার্থক্যের প্রশ্নে পুরুষকে মানদণ্ড হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে হাইনামা বলছেন, "What do we mean when we say that women and men are different? Do we mean that women are different from men i.e. that men are the standard case and women the deviant. And can this difference be

conceived in a new way?''[২১] হাইনামা নারী-পুরুষের সম্পর্ককে একটি নতুন প্রেক্ষিত থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বক্তব্যে দেহ সম্পর্কে আমরা নতুন এক ব্যাখ্যা পাই। আমরা সাধারণত sex বা যৌন পরিচয়কে প্রাকৃতিক এবং gender বা লিঙ্গ পরিচয়কে সমাজ নির্ণীত বলে মনে করি। হাইনামার মতে এই বিভাজনে লিঙ্গ পক্ষপাত রয়েছে কারণ এই তত্ত্বগুলিতে দেহকে জ্ঞানের বস্তু বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, দেহের বিষয়ীতাকে স্বীকার করা হয়নি। যেখানেই মন এবং দেহের দ্বিকোটিক বিভাজন সেখানেই বৈষম্য। হাইনামার তত্ত্বটি বিভাজন বর্জিত।

হাইনামার তত্ত্বে দেহ এবং পরিবেশের সম্পর্ক কার্যকারণ সম্পর্ক নয়। কার্যকারণ সম্পর্ক হল বাহ্যিক কিন্তু দেহের সাথে পরিবেশকে আলাদা করা যায় না। এই সম্পর্ক হল আভ্যন্তরীণ। দুটিকে আলাদা করার চেষ্টা করলে এদের সারসত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। Moitra এই প্রসঙ্গে বলছেন, ''The living perceiving body is dynamic and its relation to the external world cannot be explained in terms of causality. Causality being an external relation holding between two objects. Whether the relation between perceiving body and things it perceives are so inextricably related, they must be understood as internal relations of dependence, that means the relate cannot be separated without losing eventual parts of them.''[২২]

হাইনামার ভাবনা মার্লোপন্টির অবভাসতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত। পন্টি-র মতে আমাদের জীবন্ত প্রাণবন্ত শরীর অন্যান্য শরীরের সঙ্গে সমাজে স্থিত। আমাদের ভাবনা, কথা, বিশ্বাস, জ্ঞান, অনুভূতি, দর্শন হল শরীরের নানান প্রকার। পন্টি-র বা হাইনামা-র শরীর সম্পর্কীয় ভাবনা জীববিজ্ঞানের শরীরের মতো কোন স্থির বস্তু নয়। শরীর একটি বহু অর্থকোটিক রূপ। এই জীবন্ত প্রত্যক্ষক্ষম শরীর সদা পরিবর্তনশীল। যেহেতু intentionality মনে নয়, শরীরে স্থিত, value বা মূল্য শরীরের সাথেই যুক্ত। ফলত, মূল্য অতিরিক্ত অর্থও শরীরকেন্দ্রিক। ''By situating intentionality in the body meaning and value are simultaneously associated with the body.''[২৩] এই কারণেই শরীর বা প্রকৃতি এবং মন, সংস্কৃতির মধ্যে কোনো দূরত্ব থাকে না, তারা একাকার হয়ে যায়। হাইনামা-র মতে দেহ একটি তন্ত্র। তা হল অতীত ক্রিয়া, আজীবন প্রাপ্ত দৈহিক অভিজ্ঞতার দরুণ উৎপন্ন মূল্য এবং তাৎপর্য জমে থাকা একটি প্রস্তরীভূত স্থান।[২৪] মনে রাখতে হবে এই মূল্য এবং অর্থ সমাজ-আরোপিত নয়। আমাদের অনুভূতি, প্রত্যক্ষ, ভাবনা, বিশ্বাসের জ্ঞান এই দেহকে পরিবর্তিত করে। এই শারীরিক অভিজ্ঞতার অনুরূপ বাইরের জগতে কিছু আছে কিনা তা দেখা অপ্রয়োজনীয়। কারণ অভিজ্ঞতাগুলিই অর্থবহ এবং স্বতঃমূল্য সম্পন্ন। ''In this way the body becomes a system of signification.The stucture of individuation can not be changed by individual act. Since the body is maintained by signification it can be changed by repeated acts of subversion and deviation.''[২৫] শরীরের অর্থ বা মূল্য একমাত্র বিপরীত চর্যা দিয়ে বদল করা সম্ভব। হাইনামা মানবদেহকে 'Styles of Being' বলেন। ব্যক্তির হাসা, কথা বলার ভঙ্গি, হাঁটা চলা, সাজসজ্জা—সবই 'Style of Being'-এর অন্তর্ভুক্ত। Style কোনো স্থায়ী বৈশিষ্ট্য নয়, তা পরিবর্তনশীল। যৌনতাকে 'Styles of Being' অর্থে বুঝলে নারীসুলভভাবে কোনো নির্দিষ্ট গুণ বা ক্রিয়ার সাহায্যে বোঝা যাবে না। Style সম্পর্কে হাইনামা বলছেন, ''It is like a web or fabric of partial and varied connection...

femaleness, as a style of being cannot be pinned down by common source or form.''[২৬] এই কারণেই শরীর এবং মন, প্রকৃতি এবং সংস্কৃতি ভিন্ন নয়। Moitra-র ভাষায়—'Body is not a biological or metaphysical category. Body is a system; sex and gender are two aspects of the same system.'[২৭] এই তত্ত্বে তাই দেহ হল একটি তন্ত্র। যৌনতা এবং লিঙ্গ হল একই তন্ত্রের দুটি দিক। অতীতের এবং আজীবন প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাজাত মূল্য এবং তাৎপর্যের আধার হল এই দেহ। আমাদের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, প্রত্যক্ষ ভাবনা, বিশ্বাস ইত্যাদি এই দেহকে পরিবর্তিত করে।[২৮] Heinamaa-র অবস্থান অনেকটা Later Wittgenstein-এর মতো। হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতোই এখানে অর্থ এবং মূল্য প্রেক্ষিত থেকে এসে দানা বাঁধে। Form of life এবং চর্যার সংমিশ্রণে মূল্য ধীরে ধীরে মান্যতা পায়। দেহের কোনো পূর্বনির্ধারিত মূল্য নেই। ইতিহাস-অনপেক্ষভাবে বলা যাবে না যে দেহ মূল্যহীন বা অবান্তর।

শেষের শুরু

লিঙ্গ এবং যৌনস্বরূপের সম্পর্ক বিষয়ে বিভিন্ন রকম মতামত থেকে এটা স্পষ্ট যে কোনও একটি ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করলে এই সম্পর্কের জটিলতাকে মান্যতা দেওয়া যাবে না। আমরা দেখলাম যে সর্বজনগৃহীত যে ব্যাখ্যা যেখানে যৌনতাকে প্রাকৃতিক এবং লিঙ্গস্বরূপকে সৃজিত বলা হয়েছে তার কোনও ভিত্তি নেই। আবার লিঙ্গস্বরূপ সম্পূর্ণভাবে যৌনস্বরূপ দ্বারা নির্ধারিত, এই কথা মনে করলে এতরকম তত্ত্ব বা আলোচনার কোনো প্রয়োজন হয় না। নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে লিঙ্গস্বরূপ এবং যৌনস্বরূপ উভয়ই দৃষ্টিভঙ্গি সাপেক্ষ। হাইনামার প্রেক্ষিত থেকে দেহকে জ্ঞাতা রূপে স্বীকার করা অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য। বিজ্ঞান যতই আমাদের জানাক যে নারী-পুরুষের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন নেই, আমাদের চর্যায় নারী-পুরুষের দ্বিকোটিক বিভাজনের কোনো বিকল্প আমরা স্বীকার করতে পারি না। এই বিভাজনের অপরিবর্তনশীলতা বিজ্ঞানের তথ্যকে অগ্রাহ্য করে বুঝিয়ে দেয় যে, এই বিশ্বাসের শিকড় অনেক গভীরে। গণমাধ্যম, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমাদের চিন্তার কাঠামোর পরিবর্তন করার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করতে পারি। এই কাজ আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তব মনে হতে পারে। কিন্তু খুব বড় আকারে পরিবর্তন আনতে না পারলেও ছোট পরিসরে (small pockets) এই পরিবর্তনের সম্ভাব্যতাকে বিশ্বাস করতে হবে।

সূত্রপঞ্জি

১. Bhasin, Kamla, 1993, *What is Patriarchy*, New Delhi, Women Unlimited, p. 5.

২. Moitra, Shefali, 2002, *Feminist Thought*, New Delhi, Munsiram Monoharlal Publishers Pvt. Ltd., p. 7.

৩. Lerner Gerda, 1986, *The Creation of Patriarchy*, Oxford and New York, Oxford University Press, P. 217.

৪. Moitra, 2002, p. 13.

৫. মৈত্র, শেফালী, ২০০৩, *নৈতিকতা ও নারীবাদ*, কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃ. ১০।
৬. মৈত্র, ২০০৩, পৃ. ১০।
৭. Lerner, 1986, p. 217.
৮. Moitra, 2002, p. 7.
৯. মিশ্র, পুষ্পা ও মিত্র, মাধবেন্দ্র নাথ, ২০০৯, *সিগমুণ্ড ফ্রয়েড : মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা*, কলকাতা, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড, পৃ. ১৮।
১০. কর, পায়েল, ২০১৭, "যৌন ও লিঙ্গ-পরিচয়ের ধারণা : তার বহুমুখী আখ্যান", *দার্শনিক তত্ত্বায়নে নারীবাদ : ভিন্ন মননে বিচিত্র আলাপ*, সম্পাদনা : নন্দিতা বাগচী ও অতসী চ্যাটার্জী সিনহা, কোলকাতা, এবং মুশায়েরা, পৃ. ৮৩।
১১. Geetha, V., 2002, *Gender*, Kolkata, Stree, pp. 12-13.
১২. Ibid, pp. 16-17.
১৩. Heinamaa, Sara, 1997, "Women-Nature, Product, Style? Rethinking the foundations of Feminist Philosophy of Science", in *Feminism, Science and the Philosophy of Science*, eds. Lynn Hankinson Nelson and Jack Nelson, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, p. 289.
১৪. Moitra, 2002, p. 17.
১৫. Ibid.
১৬. Stoljar, Natlie, 2000, *Relational Autonomy : Feminist Perspectives on Autonomy*, Oxford, Oxford University Press.
১৭. Moitra, 2002, p. 23.
১৮. Ibid, p. 24.
১৯. Ibid.
২০. Ibid.
২১. Heinamaa, 1997, p. 25.
২২. Moitra, 2002, pp. 26-27.
২৩. Moitra, 2002, p. 27.
২৪. কর, ২০১৭, পৃ. ৯০।
২৫. Moitra, 2002, p. 27.
২৬. Heinamaa, 1997, p. 39.
২৭. Moitra, 2002, p. 27.
২৮. কর, ২০১৭, পৃ. ৯০।